ধীমান চক্রবর্তী

অথ সমীর রায়চৌধুরী উবাচ

শব্দ আয়োজন ক্রমান্বয়ে কবিতার গতি ও স্বতঃস্ফূর্ততার দিকে তার পাঠককে নিয়ে যেতে থাকে। ওই শব্দ অভিনিবেশ কখনও হতে পারে নৈর্ব্যক্তিক, কখনো-বা থেকে যেতে পারে জীবনের মধ্যে। আসলে কবিতার মধ্যেও লুকিয়ে আছে মানুষের এক আদিম বাসনা-আদানপ্রদান। কবি যা নির্মাণ করছেন তা সার্থক হয়ে ওঠে পাঠকের অনুভবের ভিতর, নির্ণেয় আর অনির্ণেয়র খেলার মধ্যে। কবিকৃতি ও কবির মনোভাবের অন্তস্থল ছুঁয়ে-ছেনে, পরিক্রমা লাগিয়ে নির্মিত হয় যে কবিতা পাঠক টের পান তার রূপ, রস, গন্ধ; যেন শিউরে ওঠেন সেই স্পর্শে।

> প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে কিছু শব্দ পাশ ফিরে থাকে
> প্রত্যেক শব্দের মধ্যে কিছু অক্ষর থেকে যায় স্বল্প উচ্চারণে
>
> (ছন্দ)

পাঠক ও কবি, দুজনের সামনেই কবিতা তার প্রকৃতি নিয়ে বিন্যাস নিয়ে হাজির থাকলেও তাকে চিনতে পারা কবির সহজাত। কবি ও প্রাবন্ধিক সমীর রায়চৌধুরী কবিতা লেখার স্বপ্ন ও শৈলীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই অতি সহজে কল্পনায় দেখতে পান যে এক রজতশুভ্র মাছধরা ট্রলারের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিল অচেনা পাখির ঝাঁক। এই পৃথিবীর চলনে রয়ে গেছে নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্টের অপ্রতিরোধ্য যাওয়া-আসা, সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার এক দোলাচল। কবি সমভাবনা এবং স্বপ্নের মধ্যে বাঁচেন বলে আজকের সমকালীন বা অধুনান্তিক কবিরা, নিজে নিজেরাই কবিতাকে মুক্ত করে রেখেছেন যাবতীয় অনুভবের আয়োজনে। আজকের সিংহভাগ কবিতাই হয়ে উঠতে চায় যেকোনো আধিপত্যবাদী চিন্তাভাবনার থেকে মুক্ত, অবারিত। এই অবারিত কোনো কিছুকে প্রশ্রয় দিলে তা ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে এক পরিবর্তনের দিকে; চেষ্টা করে দিশা থেকে, নির্দিষ্ট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার। সমীরবাবুর ভাষায় তাঁর প্রবন্ধ থেকে আমরা তা দেখে নিতে পারি।

'প্রাত্যহিক জীবনযাপন অবচ্ছিন্নতায় ভরা, সীমাবদ্ধতায় নিমগ্ন, নিয়মের শৃঙ্খলা, বিশেষিত সেখানে ঘটনাক্রমের প্রাধান্য, ইভেন্টের গুরুত্ব। এই অবচ্ছিন্নতা ভারাক্রান্ত করে তোলে। অখণ্ডতাবোধের সঙ্গে, ব্যাপ্তির সঙ্গে ছড়াছড়ি খেসারত জমা হয়। পুনরাবৃত্তি ক্লান্ত করে। মনের মধ্যে খণ্ডবোধ থেকে, পুনরাবৃত্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ছটফটানি বাসা বাঁধে। অখণ্ডতার চেতনায় সামিল হওয়ার উসখুস দেখা দেয়।'

(শিল্পভাষার শর সন্ধান)

এই অখণ্ডতার চেতনায় সর্বদা তিনি পুরোপুরি আক্রান্ত থাকেন বলে বারবার তাঁকে দেখা গেছে বিভিন্ন সংকলনের আয়োজনে। বহুকে তিনি মেলাতে চান এক বর্ণময় বিদিশায়। যুগ্মভাবে তিনি সম্পাদনা করেন Postmodern Bangla Poetry নামক ইংরেজি ভাষায়

অনূদিত সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় লেখা কবিতার অধুনান্তিক সংকলন। যোগসাধনের আনন্দপূর্ণ অবস্থানে সমীরবাবু নিজেকে দেখতে ভালোবাসেন বলে তিনি ভেঙে ফেলেন দেশকালের সীমারেখা। Postmodern Bangla poetry-র দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আয়োজন করেন এদেশের বাংলা কবিতা নির্মাতাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের অধুনান্তিক কবিদের কবিতারও ইংরাজি অনুবাদ যাতে স্থান পায়। মুক্ত হতে পারে কাল ও সীমাচেতনা। মনোভাব নামক দর্শনে প্রতিফলিত হয় তার মুক্তমনের পরিকাঠামো। এই যে জোড়মুখে নিয়ে আসার প্রয়াস, ক্রমাগত নিত্যনতুন সংযোজনের দিকে হাত প্রসারিত করা, তা সবচেয়ে ভালো হয় এই কবির কাছ থেকে শুনে নিলে।

কিছু কিছু শব্দের সকাল হয়ে আসছে
কিছু কিছু শব্দের রিপেয়ারিং চাই দরকার জোড়া লাগানো
কার সঙ্গে কিসের জোড়া সে কথা পেয়ারিং শব্দের মধ্যেই আছে
প্রয়োজন প্যার মহব্বত পিরিত পেয়ার
পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্বকথা না শোনালেও চলবে
(এই কবিতাটি দাঁড়াতে চায় না)

কবিতাটি দাঁড়াতে না চাইলেও কিন্তু আমরা একটু দাঁড়িয়ে জেনে নেব একাধিক, আরও সমীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত সংকলনের। মানুষের মনের সঙ্গে মনের জোড় দেওয়ায় বিশ্বাসী বলে তাঁর এ সবের আয়োজন। তিনি এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন অধুনান্তিক বাংলা কবিতার একটি হিন্দিতে অনুবাদ হওয়া সংকলনের। একটি সুপরিচিত বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত এই সংকলনটি আগের দুটি সংকলনের মতই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। বাংলা ছোটোগল্পের দুটি খণ্ডে প্রকাশিত অধুনান্তিক গল্প সংকলনও তার সম্পাদনায় অনূদিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছে প্রকাশনা জগতকে।

দুই

একটা কিছু ভর করলেই মুশকিল
মিনিং থামতে জানে না কোনো শেষকথা নেই
(একটি বহুরৈখিক টেক্সট)

মিনিং যখন থামতে জানে না, যার কোনো শেষকথা নেই তার জার্নি দেশ ও কালের সীমারেখা তছনছ করে একদিন পৌঁছে যাবে অনিঃশেষে। অধুনান্তিকতা যেহেতু একরৈখিক, একবগ্গা বা একমুখী নয়, সেজন্য বহুমত পথ লক্ষণ এসে মিশেছে এর মধ্যে। আর এখানে মিনিং থামতে জানে না বলে কবি বলতে চেয়েছেন, কবিতার কোনো মানে হয় না— কবিতাকে স্পর্শগমং করে তুলতে হলে দরকার বুঝ, অনুভব, বোঝাপড়ার। যেহেতু শব্দের নির্দিষ্ট কোনো মানে নেই, একটি শব্দের পিছনে লুকিয়ে আছে কোনো না কোনো ধ্বনি, ইশারা, সংকেত যা একটি কর্ম বা ক্রিয়াকে নির্দেশ তথা উল্লেখ করে। একটি কবিতার হাজারজন পাঠক থাকলে তা হাজারজন পাঠকের মনে আলাদা আলাদা অনুভূতি জাগাতে পারে, আলাদা-আলাদাভাবে

বেজে উঠতে পারে। একটি কবিতার সার্থকতা তো এখানেই, যার কোনো শেষ নেই। তাই তথাকথিত মিনিং-এর কোনো শেষ নেই, শেষকথা নেই। প্রায় আপ্তবাক্যের মতো উচ্চারিত উপরোক্ত লাইনটিও রওয়ানা দেয় অন্যমাত্রার দিকে, সার্থকতার বোঝাপড়ায়। শব্দ এলাকার উৎসমুখ পেরিয়ে যায় যে কোনো নির্দিষ্টতা, পৌঁছে যায় সম্প্রসারণে।

বাংলা কবিতায় পোস্টমডার্ন তথা উত্তর-আধুনিক বা অধুনান্তিক চিন্তাধারার ভাবুক হিসেবে সমীর রায়চৌধুরী একটি অন্যতম এবং অগ্রগণ্য নাম। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের অধুনান্তিক পরিসর নিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন বিদিশার দিকে। তাঁর আবিষ্কারক চেতনাকে জাগিয়ে তুলে তিনি এগিয়ে যান সম্প্রসারিত চেতনার দিকে। অখণ্ডতাবোধকে প্রশ্রয় দিতে দিতে। ওই অখণ্ডতাবোধ বা চেতনার সম্প্রসারণের পিছনে হয়তো লুকিয়ে থাকে ফুরিয়ে যাওয়া, বিশৃঙ্খলার ছন্দ বা শূন্যতার অভিমুখ। হয়তো বা কোনো এক অন্য আরম্ভ, তার সম্ভাব্যতা।

প্রত্যেক বাক্যের মধ্যে কিছু শব্দ পাশ ফিরে থাকে
প্রত্যেক শব্দের মধ্যে কিছু অক্ষর থেকে যায় স্বল্প উচ্চারণে
কিছু উপসর্গ প্রত্যেক ধাতুর সম্পর্কে থেকে যায় অর্থবিহীন
বুঝ আর অবুঝের মধ্যে বোঝাপড়া রাখে কার্যসাধিকা
নীলুদের সংসারে ছোটমাসি মুখ বুজে কাজ করে যায়—

জটিলতার কাছে সোপর্দ রয়েছে
গতির অরৈখিক নকশা
অংশ-প্রীতি, ঘুম
যেভাবে বিশৃঙ্খলা ছন্দের মুখোশ।
(ছন্দ)

শব্দ ছাড়া বাক্য হয় না আমরা জানি। কিন্তু চমকে উঠতে হয় যখন সেই শব্দ পাশ ফিরে থাকে। এবং পরের লাইনে দেখি শব্দের মধ্যে স্বল্প উচ্চারিত কিছু অক্ষরও থেকে যায়। এভাবে চিনতে পারি কিছু অর্থবিহীন উপসর্গকে। এক কার্যসাধিকা এবং নীলুর ছোটোমাসিকে। উপরোক্ত বুঝ আর অবুঝের বোঝাপড়ার মধ্যে শুয়ে থাকে এক মানবমন, যে খালি মেলাতে চায় আবার কখনো চায় বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু মেলানোর পিছনে থাকে এক ছন্দ, বিচ্ছিন্নতার পিছনেও। হয়তো তার মধ্যে সন্ধান করে নেয় নতুন মন, কল্পনা, চেতনা। মন না থাকলে সব বুঝ আর অবুঝের বোঝাপড়া বৃথা। এ ব্যাপারে আমরা একটু রবীন্দ্রনাথের 'মন' নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি। *পঞ্চভূত* গ্রন্থের 'অখণ্ডতা' প্রবন্ধে তিনি বলছেন—

'মানুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য লইতে হয়,
এইজন্য ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের
অনেক উপকার করে, কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে আমাদের সঙ্গে
কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না।'

মন আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলেমিশে থাকতে পারে না বলেই আমরা টের পাই জটিলতার, বিশৃঙ্খলতার। জটিলতার ভিতরে যে ছন্দ আছে তার বিশৃঙ্খলতার আপাত অন্তে লুকিয়ে আছে যে নতুন, যে অন্যরকম— তার। যেখানে বিদায় নেয় আধুনিক সময়ের লজিক। টের পাই এক লজিকাল ক্র্যাক-এর। যার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় মন, কবিতা, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুর বহুরৈখিকতার দিকে। 'ছন্দ' নামক উপরোক্ত কবিতাটি যখন প্রতিফলিত হয় আমাদের মনে, তখন আমরা টের পাই তার বহুরৈখিকতাকে। আমরা বরং কথাটা শুনে নিই সমীরবাবুর ভাষাতেই—

> জীবনের মধ্যে রাখা বহুরৈখিকতা রসের অফুরন্ত ভাঁড়ারকে উন্মোচিত
> রাখে। ... কবিতার গড়ন লিনিয়ার নয়, চারিদিকে ছিতরে আছে হাবভাবে।
> এক দিকের বদলে আছে দশ দিক। মানে করতে বসলে
> ফুরোবে না। যে যত ইচ্ছে, যে যার মতো, মানে করে যাও, তবু মানে
> ফুরোবে না; যেমন ফুরোয় না জীবনের মানে।
>
> (ছন্দসূত্র : *পোস্টমডার্ন কবিতা বিচার*)

এখানে লক্ষণীয় 'ছন্দসূত্র' নামক প্রবন্ধে উনি যা বলছেন তা থেকে আলোচ্য 'ছন্দ' নামক কবিতাটির একটি ধরতাই পেতে পারি। কবিতাটি শেষ চার লাইনে এসে এক অন্যতর মাত্রা পায়। দেখি— জটিলতার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গতির অরৈখিক নকশা, আটকে রয়েছে তার অংশপ্রীতি ও ঘুম। যেহেতু কবিতাটির গঠন লিনিয়ার নয়, তাই একদিকের বদলে আছে দশদিক, চারিদিকে ছিতরে রয়েছে, ছড়িয়ে আছে হাবভাবে। এরপরে শেষ লাইনে আছে 'বিশৃঙ্খলা ছন্দের মুখোশ'। একথা আজ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, আমরা জেনে গেছি যে যাবতীয় কেওসের ভিতরে রয়েছে এক ছন্দ। সমস্ত বিশৃঙ্খলার ভিতরে অনায়াসে খেলে বেড়াচ্ছে এক ছন্দময় পরিক্রমা। ফলে আমরা টের পেতে থাকি, পাঠক টের পেয়ে যান শব্দের পাশ ফিরে থাকা, অক্ষরের স্বল্প উচ্চারণে, অর্থবিহীন উপসর্গের, বুঝ ও অবুঝের বোঝাপড়ায়, ছোটোমাসির কাজ করার পিছনে ক্রমাগত এগিয়ে চলা গতিপূর্ণ নকশাটির, যে চলন নিয়ে যায় বিদিশার দিকে, যে ছন্দ নিয়ে যায় অনিঃশেষে।

তিন

> "The human brain is the supreme example of complexity
> achieved by biological evolution." (David Bohm)

পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড বোহম এই যে জটিলতার কথা বলেছেন, বুঝ ও অবুঝের ক্ষেত্রে তার লক্ষণগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। প্রচলিত ধারা কবিতার বিপরীতে আজ যে অন্যমাত্রার কবিতা লেখা নতুন বা নতুনতর কবিতা লেখা হচ্ছে, অধুনান্তিক কবিতা নির্মাণ হচ্ছে, তার একটি লক্ষণ হল আধুনিক বা ধারা কবিতায় যে যুক্তি থাকত তা আজ বিপন্ন। সমকালীন কবিতায় দেখা যায় যুক্তির বাইরে বেরোনোর প্রবণতা, কোনো ধারাবাহিকতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। কেননা ধারাবাহিকতা বা যুক্তির বাইরে বেরোতে চাইলেই অবশ্যম্ভাবী এসে পড়ে

জটিলতা ও তার চিহ্নগুলো। নিম্নলিখিত কবিতায় দেখতে পারি কীভাবে আমাদের সযত্নলালিত যুক্তিশৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে পড়েছে—

জলের প্রশ্নে আঁটকে আছি সিটকে হয়ে— জেনে
দিশারী আমাকে মা দুর্গাপুরে নিয়ে যায় দুগ্‌গার রেফ বোঝাতে
প্রথমেই জানতে চায় ত্রিমূর্তির-এর বিমূর্তি জানি কিনা।
মূর্ধন্য এর বানানে ন আছে প্রতিফলনে ণ কেন!
(৮. জলের দেশের গল্প : অংশ)

তেরোটি অংশে বিভক্ত কবিতাটির নাম 'বিনয় লিঙ্গ চিহ্ন প্রয়োগ জানতেন কিন্তু ভ্রূণ নির্ধারণ জানতেন না', যেখানে কবিতার 'মানে' খুঁজতে গেলে পাঠক পেয়ে যান যুক্তির বিপন্ন হয়ে ওঠার আভাস। বহুরৈখিক বা বহুস্বরের প্রতি ঝোঁক অথবা indeterminacy of language আমাদের হাত ধরে নিয়ে যায় নতুন কবিতার কাছে। J. Krishnamurti তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় যা আছে তাকে বাতিল করতে করতে নতুনের কাছে পৌঁছোনোর দিক নির্দেশ করেছেন। স্পষ্ট মানে সম্বলিত কেন্দ্রমুখী কবিতা থেকে বহুরৈখিক কবিতার এলাকায় প্রবেশ করতে গেলে ভাষা তথা বিষয় বা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়লেই কবিতা হয়ে উঠবে কেন্দ্রাতিগ। যেমন—

চুম্বকের ঠিক মাঝখান থেকে ঘুমন্ত জলাশয় ভেসে ওঠে
পাতালপুরীর দিকচিহ্নে গভীরতা যেখানে বিস্ময়ের পাশে শুয়ে থাকে
ক্রমশ ফুরিয়ে আসা জন্মদিনের মোমবাতি দ্রুত নিভিয়ে দেয়
বিষুবরেখার কাছাকাছি দুপুর হলে বর্ষা নামে
একটা ছটফটে ঢেউ মুঠোয় তুলে দেখে নেয়
চুম্বকের ঠিক মাঝখানে আছে আকর্ষণ আর প্রত্যাখ্যান
এক একসময় তারা শুধু পোষাক বদল করে...

(প্রাসঙ্গিকতা)

'প্রাসঙ্গিকতা' কবিতার প্রসঙ্গে বলা যায় পাঠক যদি এখানে যুক্তি খুঁজতে যান তাহলে তিনি পরিচিত হবেন যুক্তিফাটল বা লজিকাল ক্র্যাক এর। কেন্দ্র খুঁজতে গেলে তা রওয়ানা দেবে উল্টোমুখে, ছড়িয়ে পড়বে বহুমাত্রিক বহুধাবিভক্ত পথে। সুনিশ্চিত মানে, ধ্বনিমিল, প্রতীক ইত্যাদি হাতড়াতে গেলে সামনা-সামনি হবেন মিনিং এর অস্পষ্টতার বা ফিক্সিটি এড়িয়ে মানের ধারণার প্রসারিত এলাকায়। পাবেন দু-মুখ খোলা চেতনার এক সম্প্রসারিত প্রবণতা বা এলাকা।

সমকালীন কবিতায় বিনির্মাণ একটি অতি পরিচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। অন্য ধরনের, বহুমাত্রিক, পোস্টমডার্ন অথবা চৈতন্যের সম্প্রসারণে যে কবিতাই নির্মাণ হোক না কেন বিনির্মাণের সেখানে প্রায়শই একটি ভূমিকা দেখা যায়। এখানে বিনির্মিত হতে থাকে কবির অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং চেতনা। আমরা দেখতে পারি সমীর রায়চৌধুরী কেমনভাবে তাঁর

কবিতায় বিনির্মাণকে প্রশ্রয় দেন।

আমার পকেটে সারাক্ষণ যে রুমাল দেখছ
মুখ মোছার জন্য আমাকে দিয়েছিলেন এক বনবিড়াল
আমি তার নাম রেখেছিলাম মার্জার
অথচ রুমালের তন্তুজে নেই মৃজ ধাতু
আর আমার একতলায় যে ঝুলবারান্দা রয়েছে
তার অন্ধিসন্ধি শিখিয়েছিলেন এক বাবুইপাখির ঝাঁক
আমি তার নাম দিয়েছিলাম পক্ষীকূল
যার দু-দিকের পাখনায় আছে একূল ওকূল

(তন্তুজ)

কবিতার গঠন, বিগঠন তার ভাষাকে কেন্দ্র করে, যা একধরনের ভাষার গঠনতন্ত্র বলা যেতে পারে। আসলে 'কবিতার ইতিহাস ভাষার ইতিহাস'। অন্য রকমের শব্দ উচ্চারণে লেখা লাইনগুলো জন্ম দেয় এক নতুনভাবে লেখা কবিতার। তবে কবিতার ভাষা চিরকালই কাজের ভাষা থেকে আলাদা। কবিতায় কবি তার ভাবনার অভিমুখে রাখেন এক পরিবর্তিত ভাষা, যাকে বলা যায় ভাবের ভাষা।

পোস্টমডার্ন ভাবুকরা যে অজস্র চিহ্ন বা লক্ষণ দিয়ে চিহ্নিত করেন অধুনান্তিক কবিতাকে, উপরে মাত্র তার কয়েকটি লক্ষণ নিয়ে বলা হল। একথা বলার উদ্দেশ্য হল কবি-প্রাবন্ধিক-গল্পকার সমীর রায়চৌধুরী তাঁর ভাবনা চেতনায় যে সমস্ত বোধকে প্রশ্রয় দেন, তাঁর কথার অভিমুখ বারবার উন্মোচিত করতে চায় যে ভাবনার পরিমণ্ডল তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় তাঁর কবিতায়, সাহিত্যে। যাপন করতে ভালোবাসেন যে চিন্তাচৈতন্য, তাই পরিস্ফুটিত হয় তাঁর কবিতায়।

চার

এগিয়ে চলা সময়ের সাথে সাথে একজন কবির অভিজ্ঞতা, অনুভব ও উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তার কবিতা, শিল্পকর্ম। এই আলোচনার শেষপর্বে আমরা সমীরবাবুর একটি সম্পূর্ণ কবিতা পাঠ ও তার পরিচয় নেবার প্রয়াস পেতে পারি।

নিজস্ব রোদের জন্য

নতুন বাড়িটাতে যেদিন প্রথম বিকেলের রোদ এসে
জীবনের খোঁজ নিয়েছিল সেদিন থেকেই এ বাড়ির নিজস্ব রোদ
নিজস্ব হাওয়া বাতাস নিজস্ব মেঘলার জন্ম
সবকিছু যা একান্তই এ বাড়ির
যেভাবে কিছু রোদ কিছু বৃষ্টি নিয়ে বেঁচে থাকা সংসার পাতে
যেভাবে স্থানিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় মহাভাষ্য থেকে
যেভাবে ব্যক্তিগত রোদের কাতরতা নিয়ে এক সময়

পশ্চিমের বারান্দার অতসীলতাকে বাঁক নিতে দেখেছিলাম
দেখেছিলাম রোদের জন্য ঠাকুমার হাপিত্যেশ
এখনো মনে পড়ে যায় দ্বারভাঙায় আমাদের ডাইনিং টেবিলে
চা পানের সঙ্গী একচিলতে রোদ্দুর
স্কুলের ছুটির ঘণ্টার সঙ্গে চলে যাওয়া রোদের অন্য এক সম্পর্ক ছিল
যেমন কিছু কিছু ছায়ার সঙ্গে আমাদের নিভৃতের যোগাযোগ
যেভাবে কিছু রোদ কিছু ছায়া ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে জমা পড়ে
যেভাবে স্থানিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় মহাভাষ্য থেকে।

কবিতাটির প্রথম চার লাইনে হদিশ পাই বিকেলের রোদ, হাওয়া বাতাস এবং মেঘলার, যা কবি এবং কবির বাড়ির একান্ত নিজস্ব। সেই বিকেলের রোদ অনেকখানি উজ্জ্বল করে তোলে কবির মুখ, লেখার টেবিল, ছড়ানো বইপত্তর খাতা এছাড়া হয়তো বারান্দাটুকুকেও আংশিকভাবে। দেখতে পাচ্ছি সেই বিকেলের আলোয় পিঠ দিয়ে কবি তার কোনো এক প্রিয় কবির কবিতা পাঠ করছেন। উদভাসিত হয়ে উঠছে আকাশ, বাতাস, সামনের বাগানটুকু। ওই রোদে বাগানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোলাপ অথবা গাঁদা ফুল আসন্ন সন্ধেবেলার ম্রিয়মান হাসিটুকু ভুলে আরও একবার মাথা ঝাঁকিয়ে একমুখ হেসে শুভরাত্রি জানাচ্ছে জীবনের খোঁজ নেওয়া রোদটিকে। হয়তো কবি একটু বাড়ির বাইরে এসে দেখে গেলেন ওই রোদ পড়েছে রাস্তায়, সামনের মাঠে, চিকচিক করে উঠছে এমাথা থেকে ওমাথা দৌড়ে যাওয়া ফুটবল। মনে হচ্ছে কোথায় যেন বাঁশি বাজছে আর সাপের মতো দুলে উঠছে বিকেলের রোদ।

আমি যখন এসব দেখতে পাচ্ছি তখন সমীরবাবু নিশ্চয়ই এসব দেখতে পেয়েছিলেন, হয়তো এর চেয়ে অনেক বেশিই দেখেছিলেন। একজন প্রকৃত কবি বিশ্বাস রাখেন পরিমিতি বোধে। তিনি যা দেখেন, পর্যবেক্ষণ করেন— তার অনেকখানিই বা অধিকাংশই থেকে যায় কবিতা লেখার সময় প্রতিক্রিয়ার বাইরে। এ এক জার্নি, অনন্ত পরিক্রমা। তার কিছু জোড় দেয়া বা বিচ্ছিন্ন টুকরো আমরা পাই কবিতায়। এর পিছনে কাজ করে একজন কবির পরিমিতিবোধ। কবিতা নিরাকার, তবু আলোচ্য কবিতার দৃশ্য পরম্পরায় আমরা দেখতে পাই সমান্তরাল বিস্তারে এক দৃশ্য পরিপূরক হয়ে উঠেছে অন্যের।

এর পরের লাইনে এসে ভেঙে পড়ে আমাদের এতদিনকার সযত্নলালিত যাবতীয় যুক্তিগুলি। আমরা সংসার পাততে দেখি বেঁচে থাকাকে, সঙ্গে কিছু রোদ কিছু বৃষ্টি। এখানে যেকোনো সাধারণ পাঠককেই একটু থমকে দাঁড়াতে হয়, ভাবতে বাধ্য হন বেঁচে থাকার পক্ষেও তাহলে সংসার পাতা সম্ভব! এই হয়তো না দেখতে পারার পিছনে থাকে অভ্যেসের অভাব। চেতনা সম্প্রসারিত করলেই তবে বেঁচে থাকাকে সংসার পাততে দেখা যায়।

পরের লাইন দুটোতে অতসীলতা এবং ঠাকুমার রোদের জন্য আকুতি। যেন কবি ইচ্ছে করেই ধরতাই দেওয়ার জন্য রেখে গেছেন। এই জায়গায় বসে কবিতার লম্বা জার্নির মধ্যে একটু ব্রেক দিয়ে আবার শুরু করেন। যেন একটু প্রশ্রয় দেন নস্টালজিয়াকে। এরপর আমরা জানতে পারি এক চিলতে রোদ কীভাবে কবি এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ডাইনিং

টেবিলে বসে চা পান করছে। তাহলে বিকেলের রোদ চা-পানও করে! ফলে জানতে ইচ্ছে হয় সকালের চা-ও কি রোদ কখনো পান করেছে, নাকি নিয়মিত পান করে!

লক্ষ করলে দেখা যাবে এই রোদ, বিকেলের রোদ— কখনো জীবনের খোঁজ নিচ্ছে বা আলো বাতাসের সঙ্গে মিশে জন্ম দিচ্ছে নিজস্ব মেঘলার, কখনো বা এসবের সঙ্গে থেকে বৃষ্টিকে নিয়ে প্রয়াসী হয় সংসার পাততে। এই সমস্ত যাত্রাপথ যেন এক নকশা রেখে যায়। জীবন ও জগতের সব জায়গায় ছড়িয়ে-জড়িয়ে আছে এই নকশা। এবং এই নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে দেখি সময় এবং এলাকার মধ্যে, এমনকি বিশৃঙ্খলার ভিতরেও। ওই নকশা কবির অবস্থানকে চিহ্নিত করে, সাহায্য করে চিহ্নিতকরণে। কেননা সমস্ত জীবজগৎ, মানব জীবন এর ডিজাইন, রেখাচিত্র, আদল, ফর্ম, পরিকল্পনা তাই নকশাকেন্দ্রিক। এই নকশা তৈরি করে প্রকৃতির সাথে মিলন বিন্দু, আমরা হয়ে উঠি প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবুও কবি যেন দেখতে পান এ বাড়ির নিজস্ব রোদ বা ওই বিকেলের রোদ যা ক্রমে হয়ে উঠেছে এ বাড়ির একান্ত নিজস্ব তা যেন প্রকৃতি তথা মহাভাষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। এই রোদকে বিভিন্ন নকশা বা ভাষ্যের মাধ্যমে যতই শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা হোক না কেন, তার মুক্ত গতিবিধিকে যতই অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করে আমরা বাঁধি না কেন প্রবহমান চেতনার সত্যে সে বারবার ফিরে আসবে, ভেঙে ফেলবে যাবতীয় কেন্দ্রিকতা। রোদের বেঁচেবর্তে থাকার ধর্মাধর্ম নিয়ে চিন্তিত হওয়ার একেবারেই কোনো প্রয়োজন নেই।

এই জগৎ ওই মহাভাষ্য বা মহাপরিবারের অংশমাত্র। আর বিকেলের রোদ এসে ঠাকুমা, অতসীলতা, ডাইনিং টেবিল, জানলা-দরজা, প্রতিটা ইট এমনকি ঠাকুমার হাপিত্যেশকেও আশ্রয় দিয়েছে, তাতে স্বীকার পাচ্ছে এই মহাপরিবারের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্কায়নের সূত্রগুলি। ওই রোদ আর মানবসমাজ থেকে কোনোভাবেই পৃথক নয়। যেমন পৃথক নয় ওই কবির বাড়িটির নিজস্বতা থেকে। আমরা ওই নকশার আবারও খোঁজ পাই পরের লাইন দুটিতে এসে। স্কুলের ছুটির ঘণ্টার সঙ্গে রোদও চলে যায়। যেন সেও এতক্ষণ অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মিলেমিশে বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছিল। আর ছায়ার সাথে নিভৃত তথা একলা হওয়া মনখারাপের যোগাযোগ-এর কথা আমরা সবাই জানি। আমি তো দেখেছি ওই নিরালায় বসে সারাদিন ধরে কেউ-কেউ গুনে গেঁথে তুলছে মহাবিশ্বের ছায়া।

শেষ দু-লাইনে দেখি হাসি-কান্না, দুঃখ-আনন্দের মতো কবির জীবনেও জমা পড়ে কিছু রোদ ও ছায়া, তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে। আর ওই সঞ্চয় ক্রমাগত বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে নিজেই হয়ে ওঠে ব্রহ্মাণ্ড, সমগ্র জগৎ-সংসার, তাই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় মহাভাষ্য থেকে। যেন সে নিজে নিজেই লিখবে সেই মহাভাষ্য, তার একান্ত পৃথিবীর। যাবতীয় সঞ্চয় হয়ে থাকা সময়, প্রসার বা এলাকার।

আর একজন কবিই তো নিজের সৃষ্টিকর্ম, নির্মাণ নিয়ে এত বড়ো হয়ে ওঠেন যে একমাত্র তিনিই হয়তো তুলনীয় হন এই মহাপৃথিবীর।

[সূত্র : কবিতাগুলি নেওয়া হয়েছে *ভিন্নমুখ* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা এবং *পোস্টমডার্ন বাংলা কবিতা* সংকলন থেকে।]